নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ২১, পৃ. ৯৯-১১১
© ২০১৬ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

উন্নয়নের বাঁক-বঙ্কিমতা ঃ 'ডিস্‌কর্ড্যান্ট ডিভেলপ্‌মেন্ট' এর অন্তর্নিহিত পাঠ-প্রতিক্রিয়া

মোহাম্মদ মাসুদ রানা*

১. 'ডিস্‌কর্ড্যান্ট ডিভেলপ্‌মেন্ট ঃ গ্লোবাল ক্যাপিটালিজম এন্ড দ্যা স্ট্রাগল ফর কানেকশন ইন বাংলাদেশ' নামক গ্রন্থটি কেটি গার্ডনারের সম্প্রতি প্রকাশিত একটি এথনোগ্রাফিক গ্রন্থ। এই গবেষণা গ্রন্থটি বাংলাদেশের অন্যতম খনিজ সম্পদ অধ্যুষিত অঞ্চল এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্যাসক্ষেত্র হিসাবে পরিচিত বিবিয়ানা গ্যাসফিল্ড সংলগ্ন জনপদের মানুষের জীবন ও জীবিকায় গ্যাস ক্ষেত্রের যে প্রভাব, তার উপর ভিত্তি করে রচিত। দীর্ঘ আঠারো মাসের মাঠকর্ম ভিত্তিক গবেষণা গ্রন্থটিতে 'উন্নয়ন' এর বিভিন্ন গল্প বিধৃত করা হয়েছে। বৈশ্বিক পুঁজিবাদের কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে শেভরন এর কর্পোরেট দায়িত্ববোধের যে রাজনীতি, তার সাথে রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের যে যোগসূত্রতা তা যেমন গার্ডনার এই গ্রন্থে তুলে ধরেছেন, তেমনিভাবে স্থানিক পর্যায়ে শেভরন এর উন্নয়ন অনুষঙ্গী হিসেবে স্থানীয় এনজিও এফ.আই.ভি.ডি.বি এর বিকল্প উন্নয়ন প্রোগ্রাম যে একই সূত্রে গাঁথা সেই বিষয়টিও উপস্থাপন করেছেন। গ্রন্থটিতে গার্ডনার বৃহত্তর পরিসরের সাথে স্থানীয় পর্যায়ের সংযুক্ততাকে যেমন দেখিয়েছেন, একইভাবে 'কেন্দ্র' ও 'প্রান্তের' বিযুক্ততার বিষয়টিকেও এথনোগ্রাফিক তথ্যের ভিত্তিতে তুলে ধরেছেন। সর্বপরি গার্ডনার আলোচ্য গ্রন্থে জাতীয় সম্পদ, বহুজাতিকতা এবং উন্নয়ন (ব্যাপক জনগোষ্ঠীর স্বচ্ছলতা অর্থে) এর মধ্যেকার আন্ত:সম্পর্কের প্রচলিত ইতিবাচক ব্যাখাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন এবং এহেন ব্যাখ্যা যে বৈশ্বিক পুঁজিবাদী স্বার্থরক্ষায় আরোপিত সে বিষয়টি পরিষ্কার করেন। একই সাথে তৃতীয় বিশ্বের প্রতিনিধিত্বকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশে এই ধরনের উন্নয়নের নব্য-উদারনৈতিক ব্যাখ্যার অসাড়তার প্রসঙ্গটিকেও তিনি যুক্তি সহকারে সামনে আনেন। গার্ডনারের মতে, সাদামাটাভাবে বইটিতে যুক্ততা ও বিযুক্ততা, সরবতা ও নিরবতা, ক্ষমতা এবং অবদমন, অর্থনৈতিক পরিবর্তন এবং দরিদ্রতা এই বিষয়গুলোর আন্ত:সম্পর্কের বিষয়ে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।

আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে গার্ডনারের মূল আগ্রহের জায়গা প্রাকৃতিক সম্পদ, বহুজাতিকতা ও উন্নয়ন সম্পর্কের দিকে দৃষ্টিপাত করবো।এক্ষেত্রে সীমিত সম্পদ, সম্পদের মালিকানা ও স্বত্বাধিকারের মতো বিষয়গুলো যেমন আলোচনার আসবে তেমনি উপনিবেশবাদ, অভিবাসন ও বহুজাতিকতার মধ্যেকার ঐতিহাসিক সংযুক্ততার বিষয়টিকে তুলে ধরার মধ্যদিয়ে গার্ডনারের বোঝাপড়ার জায়গাটি পরিষ্কার করা হবে। দরিদ্রতা দূরীকরণে উন্নয়নের কর্পোরেট বয়ান এবং স্থানীয়দের ভাবনার বৈপরীত্যের আলোকে প্রকৃত উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগের গুরুত্বকে উপস্থাপনের মধ্যদিয়ে গার্ডনারের কাজের স্বাতন্ত্র্যকে প্রকাশ করা হবে। পরিশেষে

* সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২।
ইমেইল: masud@juniv.edu

বাংলাদেশের সমসাময়িক উন্নয়ন বাস্তবতা অনুধাবনে গার্ডনারের কাজ কি করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হবে।

১.১ প্রাকৃতিক সম্পদ, উন্নয়ন ও বহুজাতিক সংস্থার মধ্যে কোনো ধরনের অনুবন্ধ সম্পর্ক রয়েছে কীনা সে বিষয়ে জানতে তিনি তার গ্রন্থে মোটাদাগে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। আর এই প্রশ্নটি হলো: শেভরনের মতো বহুজাতিক কোম্পানিসমূহ কি গ্রামীণ সম্প্রদায়ের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে? নাকি শুধু সম্পদ আহরণের শক্তি হিসেবে কাজ করে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে গার্ডনার ব্যাষ্টিক অর্থনীতির আলোচনায় বাংলাদেশের গ্যাস সম্পদের বিভিন্নমুখী রাজনৈতিক স্বরূপকে উপস্থাপন করার পাশাপাশি বিশ্বায়নের ভঙ্গুর সম্পর্কের চিত্রকেও সামনে আনেন। তাছাড়া এই বিষয়টিকে পরিস্কার করতে গিয়ে তিনি প্রাকৃতিক সম্পদের অভিশাপ (The 'Curse' of natural resources) নিয়ে বিদ্যাজাগতিক বির্তকটি তুলে ধরেন। গার্ডনার দেখান সম্পদের অভিশাপের বিষয়টিকে Ballard (2003) যেখানে অর্থনৈতিক স্থিরতা, দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সাথে সম্পর্কিত করে দেখান। বিশ্বব্যাংকের অর্থনীতিবিদরা সেখানে বিষয়টিকে দরিদ্র দেশগুলোর রপ্তানিখাতে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিক নির্ভরশীলতার ফলাফল হিসেবে দেখান। অপরদিকে Collier (2007) এই বিষয়টিকে দরিদ্র দেশগুলোর জন্য 'প্রাকৃতিক সম্পদের ফাঁদ' ('the natural resource trap') হিসাবে অভিহিত করেন (পৃষ্ঠা:১৯)। তিনি দেখান দরিদ্র দেশসমূহ প্রায়শই এই ফাঁদে আটকে যায়। আর এর অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে তিনি প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে উপার্জিত আয়ের উপর দরিদ্র দেশগুলোর অধিকমাত্রায় নির্ভরশীল হওয়াকে দায়ী করেন। তিনি দেখান এর ফলে দরিদ্র দেশের জনগণ তাদের সাধারণ উৎপাদনশীল কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। যার ফলে অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটে। দ্বিতীয় কারণটিকে কলিয়ার 'ডাচ রোগ' ('Dutch Disease') হিসাবে আখ্যায়িত করেন। কারণ এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে এতো বেশি আয় হয় যে, এর ফলে দেশে খুব দ্রুত মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। ফলাফল হিসাবে দেশীয় রপ্তানিকৃত পণ্যের বাজার মার খেয়ে যায়। তৃতীয় কারণটির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে কলিয়ার বলেন, প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ উত্তোলন ও উৎপাদন কৌশলের জন্য প্রচুর বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। দরিদ্র দেশগুলোর পক্ষে এই ধরনের বিনিয়োগ করা সম্ভব হয় না। ফলে তারা ধনী বিদেশী কোম্পানির দারস্থ হয়। আর এটিই অন্যের দ্বারা 'পরিবেষ্টিত হবার প্রবণতা' ('enclave tendencies') তৈরী করে (Auty,1993)। কারণ এই প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে যে পরিমাণ অর্থ উপার্জিত হয় তার একটি বৃহৎ অংশই বিদেশী কোম্পানির হাতে চলে যায়। চতুর্থ কারণ হিসাবে সরকারের অবিবেচক আয়-ব্যয় নীতি ও দুর্নীতির বিষয়টিকে সামনে আনা হয়। কারণ অনেকক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে অর্জিত আয়ের বিষয়টি সরকারকে অধিক ব্যয় ও বেশী ধার করার প্রবণতার দিকে ধাবিত করে। কিন্তু বাস্তবতা হলো বিশ্ববাজারে প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের চাহিদা সবসময় স্থিতিশীল থাকে না। যখন দাম পড়ে যায় তখন তা অর্থনৈতিক কাঠামোর জন্য হুমকী হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া যখন কোন সরকার প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে প্রচুর পরিমাণ আয় করেন তখন তার মধ্যে স্বল্প সময়ে প্রচুর অর্থ উপার্জনের একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যা অনেক সময় দুর্নীতিকেই উদ্বুদ্ধ করে (পৃষ্ঠা: ২০)। এই সমস্ত কারণেই প্রাকৃতিক সম্পদ দরিদ্র দেশগুলোর জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায় বলে কলিয়ার মনে করেন।

গার্ডনার উপরোক্ত বির্তকটি উপস্থানের মধ্য দিয়ে তার গবেষণা এলাকা দুনিয়াপুরের[১] ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদ (গ্যাস) কিভাবে অভিশাপ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে সেই বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। তিনি দাবী তুলেছেন যে, দুনিয়াপুরের ক্ষেত্রে কলিয়ার বর্ণিত তৃতীয় কারণটি বেশী কাজ করেছে। কারণ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে মাটির নিচে গ্যাস এর মজুদের বিষয়ে প্রায় নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও তার উত্তোলন ও সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য যে পরিমাণ বিনিয়োগ ও কারিগরি সহায়তার দরকার সে পরিমাণ অর্থ ও প্রযুক্তিগত সবলতা না থাকায় বাংলাদেশকে অক্সিডেন্টাল, ইউনিকল ও শেভরন এর মতো বহুজাতিক সংস্থাগুলোর মুখোপেক্ষী হতে হয়। আর এই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বৈশ্বিক পুঁজিবাদী কায়দায় তাদের মুনাফা সর্বোচ্চকরণকে নিশ্চিত করে। ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের মজুদ থাকা সত্ত্বেও তখন আর তা আর্শিবাদ হিসেবে বিবেচিত হয় না বরং তা অভিশাপ হিসেবেই আর্বিভূত হয়।

১.২ গার্ডনার দুনিয়াপুরে কাজ করতে গিয়ে দেখতে পান এই অঞ্চলের মানুষজন ভূমি, খাদ্য ও কর্মসংস্থানের মতো সীমিত সম্পদগুলোকে কেন্দ্র করে প্রতিনিয়ত সংগ্রামে লিপ্ত হচ্ছে। সীমিত সম্পদের এহেন সংগ্রাম ও অসমতার বিষয়টি অনুধাবন করতে গিয়ে গার্ডনার Sen (1982, 1999) এর 'স্বত্বাধিকার' ('entitlement') এর তত্ত্বটিকে সামনে আনেন। যেখানে Sen দেখান কিছু লোকের অনাহারে থাকার বিষয়টি কোনভাবেই খাদ্য মজুদের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল নয় বরং পণ্যের মালিকানার উপর বিষয়টি নির্ভর করে। তাঁর মতে, কোন ব্যক্তি যদি নির্দিষ্ট খাদ্যের মালিকানা পায় তবেই সে পণ্য হিসেবে ঐ খাদ্যকে ব্যবহার করে তার ক্ষুধা নিবারণ করতে পারে। তাই তিনি অনাহারের বিষয়টিকে বোঝার ক্ষেত্রে মালিকানা কাঠামোর অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলোকে খুঁজে দেখার প্রয়োজনীয়তার কথা প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, খাদ্যের মালিকানার বিষয়টি এক ধরনের অধিকারের সম্পর্ককে প্রকাশ করে, যা আবার ঐ ব্যক্তির নিজস্ব প্রতিভা, তার উৎপাদনশীলতা এবং বিনিময়ের ক্ষেত্রে তার সফলতার উপর নির্ভর করে। গার্ডনার দেখান দুনিয়াপুরের ক্ষেত্রে এই অধিকারের (endowment) বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত করার ক্ষেত্রে সম্পদের মালিকানা ও বাজার ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হলেও জনগণের স্বত্বাধিকারের বিষয়টি অপ্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক সম্পর্কের[২] উপরই নির্ভরশীল থাকে (পৃষ্ঠা:৩৮-৪০)।

গার্ডনার এথনোগ্রাফিক তথ্যের ভিত্তিতে দেখান, দুনিয়াপুরের দরিদ্র মানুষদের কাছে সংযোগটাই (connection) প্রধান। কারণ এর উপর ভিত্তি করেই তারা তাদের বেঁচে থাকা নিশ্চিত করে (Gardner, 2008; Gardner and Ahmed, 2009)। সংযোগের বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গার্ডনার Bourdieu (1983) ও Putnam (2000) এর 'সামাজিক পুঁজি'র ('social capital') ধারণার অবতারণা করেন। বুর্দো তার বিশ্লেষণে সামাজিক পুঁজিকে শ্রেণি ক্রমোচ্চতার ধারণার সাথে সম্পর্কিত করে দেখান। অন্যকথায় তিনি সামাজিক পুঁজিকে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত করেন (পৃষ্ঠা:৪১)। অপরদিকে Putnam (2000) বিশ্ব ব্যাংকের সামাজিক পুঁজির ধারণাটিকে সামনে এনে দেখান, সেখানে কিভাবে সামাজিক পুঁজির ধারণাকে একটি ক্রমবিকাশমান উন্নতির ধারণার সাথে যুক্ত করে উপস্থাপন করা হয়। এক্ষেত্রে Putnam আরোও পরিষ্কার করে বলেন, এখানে সামাজিক পুঁজি বিভিন্ন স্বতন্ত্র ব্যক্তির

মধ্যেকার সংযোগকেই নির্দেশ করে। গার্ডনারের মতে দুনিয়াপুরকে বোঝার জন্য বুঁর্দো ও পুটনাম উভয়ের কাছে সামাজিক পুঁজির ধারণাই গুরুত্ববহ হয়ে উঠে। কারণ এখানে সামাজিক সংযোগ যেমন অপ্রতাষ্ঠানিক সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করে তেমনি এটি দুর্নীতি, পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থনৈতিক ক্রমোচ্চতা রক্ষার বাহক হিসাবেও কাজ করে (পৃষ্ঠা:৪৩)। গার্ডনারের এহেন আলোচনা সম্পদের মালিকানা ও স্বত্বাধিকার বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক কেন্দ্রিক পাশ্চাত্য আধিপত্যশীল ভাবনাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করায় এবং বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এই ধরনের বিশ্বাসের অকার্যকারিতাকেই প্রকাশ করে। যা এক অর্থে সংযোগকে কেন্দ্র করে গার্ডনারের প্রকৃত অবস্থানকে প্রমাণযোগ্য করে তোলে।

২. গার্ডনার বাংলাদেশে উন্নয়নের নব্য-উদারনৈতিক বয়ানের প্রেক্ষাপট অনুসন্ধানে উপনিবেশবাদ, অভিবাসন ও বহুজাতিকতার মতো বিষয়গুলোর ঐতিহাসিক সংযুক্ততাকে সামনে তুলে ধরেন। গার্ডনারের মতে বাংলাদেশে উপনিবেশিকতার অভিঘাত বর্তমানের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেও চালু রয়েছে। তাছাড়া সিলেট অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের অভিবাসনের ইতিহাসকে বিবৃত করতে গিয়ে তিনি অভিবাসন ও সম্পদের পুঞ্জীভবনের মধ্যেকার অনুবন্ধ সম্পর্ক খুঁজে পান এবং এই সম্পর্ক কিভাবে উপনিবেশিক লিগাসিকে ধারণ করে সে বিষয়ে প্রস্তাবনা দাঁড় করান।

২.১ গার্ডনার দেখান বাংলায় ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের আগমন পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ থেকে ঘটলেও মূলত ১৭৫৭ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পলাশীর যুদ্ধে জয় লাভের মধ্যদিয়ে এই ঔপনিবেশিক অভিঘাতের যাত্রা শুরু। ১৮৭৫ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর এর ব্যাপ্তি আরোও প্রসারিত হয়। কারণ এসময়ে বাংলার শাসন ক্ষমতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে চলে আসে (Baxter,1997)। পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান বিভাজন এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নামক নতুন জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও, ঔপনিবেশিক অভিঘাত থেকে দেশটি পুরোপুরিভাবে মুক্ত হতে পারেনি। গার্ডনার বলেন নানা চড়াই উৎড়াই এর মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা এগিয়ে যেতে থাকলেও ঔপনিবেশিক সময়ে লালন করা মানসিকতার চর্চা, বিশেষ করেঃ দলীয়করণ, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির মতো বিষয়গুলো এর সঠিক বিকাশের পথকে নানাভাবে বাধাগ্রস্থ করে (পৃষ্ঠাঃ ৬৯)। তাছাড়া উপনিবেশিক শাসকরা বাংলাদেশের উপর তাদের পরোক্ষ শাসন ও শোষণ কায়েম করার স্বার্থে নানা সময়ে বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নেন। বিশেষ করে স্বাধীনতা যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ত্রাণ ও সাহায্য প্রদানের নামে এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে 'উন্নয়ন' এর নামে বহুজাতিক সংস্থাগুলোর অনুপ্রবশকে নিশ্চিত করছে (পৃষ্ঠাঃ ৭১)।

২.২ বাংলাদেশের ঔপনিবেশিক ইতিহাস বিবৃত করার পাশাপাশি গার্ডনার সিলেট অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের অভিবাসনের ইতিহাসকেও সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরেন। যেখানে লেখক সিলেট অঞ্চলের আন্তর্জাতিক অভিবাসনের চিত্র বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে স্বতন্ত্র হবার কারণ হিসাবে ব্রিটেনের সাথে এই অঞ্চলের মানুষের বিশেষ সংযোগের বিষয়টির কথা উল্লেখ করেন। তিনি দেখান ব্রিটেনের সাথে সিলেটের যোগাযোগ শুরু হয় উনবিংশ শতকে। এসময় ব্রিটিশ স্টিমারগুরোতে সিলেটিরা 'খালাসী' বা 'লস্কর' হিসাবে কাজ করতো। সিলেটিদের খালাসি হবার পিছনের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে গার্ডনার সিলেট অঞ্চলের তালুকদারী ব্যবস্থা, এর নদীবিধৌত ভৌগোলিক অবস্থান এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শ্রমিক চাহিদার মতো

বিষয়গুলোকেই নির্দেশ করেন। গার্ডনারের মতে এই বিষয়গুলোই পরবর্তীতে লন্ডনে সিলেটি অভিবাসনকে ত্বরান্বিত করে (পৃষ্ঠা ৭৬-৭৭)।

গার্ডনার দুনিয়াপুরে অভিবাসন এবং এর প্রেক্ষিতে সংগঠিত পরিবর্তনের বিষয়টি দেখাতে গিয়ে অভিবাসন এবং সম্পদের পুঞ্জীভবনের মধ্যে এক ধরনের অনুবন্ধ সম্পর্ক খুঁজে পান। তিনি দেখতে পান অভিবাসনের কারণে এলাকায় অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের পাশাপাশি সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনও সাধিত হয়েছে (পৃষ্ঠা:৮৩)। তিনি বলেন এ পরিবর্তনের প্রভাব শুধুমাত্র অভিবাসী গৃহস্থালীর উপরই পড়েনি, ঐ এলাকার যারা অভিবাসনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায় নি তাদের মানসপটেও এর স্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যাকে Vertovec (2010) 'ট্রান্সন্যাশনাল হ্যাবিটাস' ('transnational habitus') হিসাবে আখ্যায়িত করেন (পৃষ্ঠা:৮৪)। গার্ডনার দেখান, অভিবাসনের ফলে স্থানীয় পরিসরে নতুন একধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের সৃষ্টি হওয়ায় সেখানে সমাজের আধিপত্যশীল অবস্থানে চলে আসে নতুন একটি শ্রেণি হিসাবে লন্ডনে বসবাসকারী সিলেটিরা। যারা স্বশরীরে দেশে উপস্থিত না থেকেও গ্রামের অধিকাংশ জমির মালিকানার দ্বারা দূর থেকেই স্থানীয়দের উপর আধিপত্য খাটায়। আর এভাবেই সিলেট অঞ্চল ঔপনিবেশিক ইতিহাসের লিগাসিকে ধারণ করে বলে গার্ডনার মনে করেন।

গার্ডনার আরোও দেখান যে, মানুষ এবং স্থানের মধ্যেকার সম্পর্ক কেবলমাত্র একরৈখিক সংযোগকেই নির্দেশ করে না। কেননা ১৯৯০ সালে সিলেট অঞ্চলে গ্যাস অন্বেষন করার সময় থেকে ২০০৬ সালে দুনিয়াপুরে বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্র নির্মাণ কাজ শুরুর পুরোটা সময়জুড়ে বহুজাতিক শক্তি সংস্থা হিসাবে প্রথমে অক্সিডেন্টাল (১৯৯০), পরে ইউনিকল (২০০৪), এবং শেষ পর্যন্ত শেভরন (২০০৫) এদেশের তাদের কর্মক্ষেত্র খোঁজার প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখে। সিলেটে প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ বহুজাতিক সংস্থার পুঁজি আহরণের নতুন দ্বার উন্মোচন করে। অনেকের মতে, এটি তাদের জন্য নতুন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠারই সামিল। কারণ প্রাকৃতিক সম্পদ হিসাবে গ্যাস আহরণের মধ্য দিয়ে বহুজাতিক সংস্থাগুলো পুঁজির সঞ্চয়নকে নিশ্চিত করে। যা আবার বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। গার্ডনার দেখান, বহুজাতিক কোম্পানির সাথে বাংলাদেশের বিশেষত দুনিয়াপুরের এধরনের সংযোগ গভীর অনিশ্চয়তা এবং অসংঙ্গতিকেই সামনে নিয়ে আসে। কারণ বহুজাতিক কম্পানিগুলো উন্নয়ন করতে এসে স্থানীয় পরিসরে সংযোগ স্থাপন না করে বরং ভাঙ্গনকেই ত্বরান্বিত করে (পৃষ্ঠা:৯০,৯১)। অন্যকথায় এই ধরনের সংযোগ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে বহিঃস্থ হস্তক্ষেপকে প্ররোচিত করে। যা কোনভাবেই রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য ফলদায়ক হয় না।

৩. বহুজাতিকতা, গ্যাসক্ষেত্র এবং উন্নয়নের পারস্পরিক সম্পর্কের বাঁক-বঙ্কিমতাকে প্রকাশ করতে গিয়ে গার্ডনার দুনিয়াপুরের কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ জীবনের পরিকাঠামোকে উপস্থাপন করে দেখান যে, গ্যাসক্ষেত্র এই অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকায় কি ধরনের নেতিবাচক পরিবর্তনকে সামনে আনে এবং এই পরিবর্তন মোকাবিলায় স্থানীয় জনগণ কোন ধরনের কৌশলের আশ্রয় নেয়। তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন কীভাবে দুনিয়াপুরে কৃষিজ জমি অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সম্পদের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। এমন কি যাদের জমির মালিকানা নেই তাদের ক্ষেত্রেও বিষয়টির উপযোগিতাকে তিনি লক্ষ্য করেন (পৃষ্ঠা: ১০৪,১০৫)। তাছাড়া দুনিয়াপুরের

কৃষি কাঠামোর পরিবর্তনশীলতাকে দেখাতে গিয়ে তিনি চিরায়ত শ্রম ও বর্গাচাষের অপ্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্কের বিপরীতে কীভাবে অর্থনির্ভর সামাজিক সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে সে বিষয়টি উপস্থাপন করেন। অন্যদিকে তিনি তার আলোচনায় পরিবেশগত পরিবর্তনের বিষয়টিকে সামনে তুলে ধরেন। বিশেষত ভূমি কেন্দ্রীক মানুষের জীবিকায় গ্যাসফিল্ডের ব্যাপক প্রভাব পড়ছে বলে তিনি মনে করেন। যদিও শুরুর দিকে গ্রামবাসিরা মনে করতো যে, গ্যাসক্ষেত্র তাদের অনেক উপকারে আসবে কিন্তু পরবর্তীতে তাদের সে স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। কারণ গ্যাসক্ষেত্রে কায়িক-শ্রমের তেমন ব্যবহার নাই। শেভরন বাহিরের জেলাগুলো থেকে কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে শ্রমিক ভাড়া করে নিয়ে আসে পুঁজিবাদী কায়দায়। এক্ষেত্রে কন্ট্রাক্টররা প্রাতিষ্ঠনিক চুক্তিভিত্তিক সম্পর্কের পরিবর্তে শ্রমিকদেরকে ভৌগলিক ও সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ করছে বলে অভিমত প্রকাশ করেন গার্ডনার (পৃষ্ঠাঃ ৫৩,৫৪)। সেদিক থেকে বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্র মানুষের দীর্ঘদিনের কৃষিভিত্তিক জীবিকা সম্পর্ককে নতুন মাত্রা দিয়েছে এবং কৃষি জমি নির্ভর শ্রম সম্পর্কে পরিবর্তন ঘটিয়েছে। তবে এই সম্পর্ক বৈশ্বিক পুঁজিবাদী স্বার্থকেই তরান্বিত করছে বলে গার্ডনার মনে করেন।

তাছাড়া উন্নয়নের ক্ষেত্রে অপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ কীভাবে ব্যাক্তির স্বত্বাধিকারের ভাবনাকে প্রভাবিত করে সে বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে গার্ডনার সামাজিক সম্পর্ক ও নৈতিকতার প্রসঙ্গটিকে সামনে আনেন। গার্ডনার দেখান সামাজিক সম্পর্ক ও নৈতিকতার ভিত্তিতে গড়ে উঠা অপ্রতিষ্ঠানিক যোগাযোগ বজায় রাখার মধ্য দিয়ে দুনিয়াপুরের দরিদ্র শ্রেণির লোকেরা তাদের সংকটপূর্ণ অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করে। দুনিয়াপুরের প্রাপ্ত তথ্য থেকে লক্ষ্য করা যায় এ গ্রামের বেশীরভাগ দরিদ্ররা তাদের জীবন-জীবিকার জন্য এধরনের সামাজিক সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল থাকে (পৃষ্ঠাঃ ২৩৪)। গার্ডনার এই ধরনের অপ্রতিষ্ঠানিক যোগাযোগ কিছু সুনির্দিষ্ট নৈতিকতার ধরন, উদার দানশীলতা এবং জ্ঞাতি সম্পর্কের মত বিষয়গুলো দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। যা সংযোগ রক্ষাকারী জনগণের মনে কিছু ভাবনা এবং প্রত্যাশা তৈরীতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে বিদেশ যাওয়ার প্রচেষ্টা এবং বিদেশে প্রতিষ্ঠা লাভের বিষয়কে কেন্দ্র করে এই ভাবনাগুলো আবর্তিত হয়। যেমন লন্ডনিরা[৩] তাদের নিজ দেশে অবস্থানরত আত্নীয়দের বিদেশ যেতে (ইংল্যান্ড, মধ্যপ্রাচ্য) এবং বিদেশে প্রতিষ্ঠা লাভের ক্ষেত্রে আর্থিক ভাবে অথবা অন্য যেকোন উপায়ে সাহায্য সহযোগিতা করবে এমনটিই আশা করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের ভাবনা দাবীতে পরিণত হতেও লক্ষ্য করা যায় (পৃষ্ঠাঃ ১৫২,১৫৩)। গার্ডনারের মতে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত লন্ডনিরা এবং দেশে অবস্থানরত দরিদ্র লোকেরা নিজেদের প্রয়োজনে এধরনের নৈতিকতার সম্পর্ক তৈরী করে। অর্থাৎ বিষয়টি দ্বিপাক্ষিক। যা সংকটপূর্ণ অবস্থা মোকাবিলায় অভিবাসী এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতাকে প্রকাশ করে। কারণ এক্ষেত্রে তারা দাতা সংস্থা বা বহুজাতিক সংস্থার উপর নির্ভরশীল না থেকে নিজেদের মত করে সংকট নিরসনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। গার্ডনারের মতে, এটি একভাবে উন্নয়ন প্রশ্নে স্থানীয় জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত বহুজাতিক সংস্থার মহা-বয়ানের (সাহায্যপ্রার্থী, নির্ভরশীল ইত্যাদি) সীমাবদ্ধতাকেই হাজির করে।

৪. প্রাকৃতিক সম্পদ, বহুজাতিক সংস্থা এবং উন্নয়নের পারস্পরিক সম্পর্কের বোঝাপড়ায় গার্ডনার উন্নয়নের কর্পোরেট গল্পকে সামনে হাজির করে বলেন, এই ধরনের গল্পে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্বের মতো

বিষয়গুলো ঢালাওভাবে প্রচার করার মধ্য দিয়ে কর্পোরেট বহুজাতিক সংস্থাগুলো তাদের সুনাম ও নৈতিক বাণিজ্য চর্চার দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু বাস্তবে স্থানীয় জনগণের সাথে কর্পোরেট সংস্থাগুলোয় অংশীদারিত্বের বিষয়টি একেবারেই কাল্পনিক ও নির্মিত ধারণা।এ বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য গার্ডনার দুনিয়াপুরের দরিদ্র মানুষগুলোর বঞ্চিত হওয়ার গল্প, তাদের দুঃখ দুর্দশার বয়ানসমূহকে (যেগুলো বিশ্বব্যাপি উন্নয়ন বাদীদের ও ভোক্তাশ্রেণির কাছে প্রচারিত হয় না) বিশ্লেষণাত্মক ভাবে তুলে ধরার প্রয়াস পান। তাছাড়া উন্নয়ন এজেন্সী ও বহুজাতিক সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতাগুলো প্রকাশ করার পাশাপাশি এর সমাধানের দিক নির্দেশনাও তিনি প্রদান করেন।

৪.১ আলোচনার তৃতীয় অংশে আমরা যেখানে দেখতে পাই, স্থানীয় জনগণের দাবী ও গল্পগুলো সামাজিক সংযোগ বা যোগাযোগের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় সেখানে উন্নয়নের কর্পোরেট গল্পগুলো সামাজিক সংযোগ ও বিচ্ছিন্নতার ধারণাকে একেবারে ভিন্ন ভাবে উপস্থাপন করে। এখানে ক্ষমতায়নের প্রশ্নে স্থানীয় সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত নির্ভর বিষয়গুলোকে (স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থান) উপেক্ষা করে কেতাদুরস্ত প্রচলিত নৈতিকতার ধারণাকে সামনে নিয়ে আসা হয়। যেখানে মনে করা হয় স্থানীয় জনসাধারণকে সাহায্য করা একান্ত প্রয়োজন যাতে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে সাহায্য করতে পারে (পৃষ্ঠা:২৩৫)। 'আত্ম-সাহায্য' (self-help) করার এমন ধারণা বাস্তবিক অর্থেই বৈশ্বিক পরিসরে শেভরনের খ্যাতিকে যেমন ছড়িয়ে দেয় তেমনি একই সাথে গ্যাস ক্ষেত্রে তাদের অর্ন্তভুক্তি ও মুনাফা সর্বোচ্চকরণের নীতিকেও ত্বরান্বিত করতে সাহয্য করে। তাছাড়া শেভরন তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতার নামে অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম দ্বারা নব্য-উদারনৈতিক ডিসকোর্সকে সামনে আনে। যা আত্ম-সাহায্যকরণের আদর্শকে গ্রহণ করে এবং এর স্থায়ীত্বের জন্য দাতাদের সাথে সংযোগ বজায় না রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করে। গার্ডনার বলেন এখানে দাতাদের সাথে সংযোগহীনতা বা বিচ্ছিন্নতার বিষয়টি আত্ম-উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে বলে দাবী করা হচ্ছে। এহেন ধারণা গ্যাস ক্ষেত্রে শেভরনের নৈতিক অবস্থানকে এবং স্থানীয় পর্যায়ে তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার দাবীকে আরোও পাকা-পোক্ত করছে বলে গার্ডনার মনে করেন। কিন্তু গার্ডনার বলেন বাস্তবতা হচ্ছে শেভরন কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার নামে বিভিন্ন কার্যক্রমের দ্বারা উন্নয়নের বহুবিধ ধরন ও বয়ানকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার উপযোগী করে সামনে আনছে। যেগুলোর কোনটাতেই দেশীয় শিল্পের বিকাশ, কর্মসংস্থান ও জবাবদিহিতামূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মত বিষয়গুলোর ভিত্তিতে গড়ে উঠা স্থানীয়দের উন্নয়ন ভাবনার প্রতিফলন ঘটে না (পৃষ্ঠা:২৩৫,২৩৬)। বরঞ্চ এখানে পরিমাণগত উপাত্ত এবং জরিপ কর্মের ফলাফলের ভিত্তিতে প্রশ্নাতিতভাবে জনগণকে সমরূপ হিসেবে উপস্থাপন করে তাদের দরিদ্রতা দূরীকরণের পদ্ধতি হিসেবে একরৈখিক মানদন্ড (প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণের সহযোগে সীমিত পরিসরে আয় বর্ধনশীল কার্যক্রমের দ্বারা আত্ম-উন্নয়ন) আরোপ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

৪.২ গ্যাসফিল্ড স্থাপনের প্রাথমিক সময়কালে এর বিপক্ষে অবস্থানকারীদের ইতিহাস পর্যালোচনার ভিত্তিতে গার্ডনার দেখান কিভাবে স্থানীয় রাজনীতি ইউনিকল ও শেভরনের মতো বহুজাতিক সংস্থার উপস্থিতি দ্বারা পরিবর্তিত হয় (পৃষ্ঠা:৫৫)। গার্ডনার জানান গ্যাস ফিল্ডের ইতিহাসকে বর্ণনা করতে গিয়ে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের কণ্ঠে যে গল্পগুলো উঠে আসত তার কেন্দ্রীয় বিষয় থাকত বহুজাতিক সংস্থার বিরুদ্ধে নিপীড়নের অভিযোগ

এবং দুর্নীতির গুজব। এমনকি তাদের বিশ্লেষণে প্রায়শই উঠে আসত গ্রামীণ রাজনীতি এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তিসমূহের উপর উৎপীড়নের খড়্গ নেমে আসার কাহিনী (পৃষ্ঠা:৫৫)। যদিও তিনি মনে করেন দুর্নীতির গুজবসমূহকে বৃহত্তর পরিসরে শোষণ ও ক্ষমতাহীনতার ধারণা দ্বারা বিশ্লেষণ করা সম্ভব। গার্ডনার প্রসঙ্গক্রমে এই বিষয়টিও উল্লেখ করেন যে, জাতীয়তাবাদী অ্যাক্টিভিষ্টদের[৪] বয়ানসমূহ জ্ঞান এবং গল্পের ভিন্ন ধরনকে চিত্রায়িত করলেও এধরনের বয়ানের মূল বিষয় হিসেবে থেকেছে দুর্নীতি এবং সামাজিক অসমতা। জাতীয়তাবাদী অ্যাক্টিভিষ্টরা বাংলাদেশে বহুজাতিক কম্পানির উপস্থিতিকে যেমন প্রশ্নবিদ্ধ করেন তেমনি গ্যাসফিল্ড স্থাপনেরও বিরোধিতা করেন (পৃষ্ঠা:২৩৬)। গার্ডনার দেখান নব্য-উদারনৈতিক নৈতিকতা যেখানে ব্যক্তি ক্ষমতায়ন ও স্থানিকতা কে গুরুত্ব দেয়। তার বিপরীতে অ্যাকইটভিষ্টরা মার্কসবাদী ধারণায় প্রভাবিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের এহেন নীতিকে সমালোচনা করেন। তারা পদ্ধতিগতভাবে শেভরনের নব্য-উদারনৈতিক দাবীকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং এর বিপরীতে শেভরনের মতো বহুজাতিক সংস্থার উপস্থিতিকে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি হিসেবে মনে করেন। প্রায় একই রকম বিশ্লেষণ গার্ডনার দুনিয়াপুরে বসবাসকারী সাধারণ জনগণের কাছ থেকেও পান। যদিও তাদের বিশ্লেষণের ভিত্তি কোনভাবেই বৈশ্বিক যোগাযোগ ও ক্রমোচ্চতার মতো বিষয়গুলো নয় বরং স্থানীয় জ্ঞান এবং ব্যক্তিগত বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তারা এধরনের বিশ্লেষণ হাজির করে বলে লেখক দাবী করেন (পৃষ্ঠা:২২২,২২৩)।

৪.৩ উন্নয়নের কর্পোরেট গল্প এবং জনসম্পৃক্ততা বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে গার্ডনার বলেন কর্পোরেট গল্পগুলো প্রায়শঃই স্থানীয়দের প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। গ্যাসফিল্ডে বিস্ফোরণ ও আগুন লাগার মতো ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুনিয়াপুরের জনগণের ভাষ্যে উঠে আসা ক্ষতির গল্পগুলোর বরাত দিয়ে গার্ডনার বলেন এই গল্পগুলো মূলত গ্যসফিল্ডের আশেপাশে বসবাসকারী জনমনে আগুন লাগার ভীতি এবং এর দ্বারা সৃষ্ট পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতির বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। গার্ডনার দেখান এই বয়ানগুলো সরাসরিভাবে স্থানীয় সুবাধাভোগি ধনী শ্রেণির বয়ান ও শেভরনের আধিপত্যশীল বয়ান (যা বৃহত্তর পরিসরে একদল শ্রোতা শ্রেণি তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে) কে প্রশ্নবিদ্ধ করে। লেখক দাবি করেন স্থানীয় জনগণের এই ধরনের বয়ান (যা অনেক ক্ষেত্রেই অ-শ্রুত) গ্যাসফিল্ডের বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন ঘটাতে পারে, যা আধিপত্যশীল বয়ানে একেবারেই অনুল্লেখিত থাকে (পৃষ্ঠা:২৩৬,২৩৭)। লেখক স্থানীয় জনগণের বিবৃতি দিয়ে দেখান কিভাবে তাদের কৃষি কেন্দ্রিক ও মৎস্য ভিত্তিক জীবন-জীবিকার বিষয়টি মুনাফা কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দ্বারা ধীরে ধীরে অবলুপ্তির দিকে যাচ্ছে। যা একভাবে জনগণকে কৃষিজ জমি থেকে যেমন বিচ্ছিন্ন করছে তেমনি সাহায্য পাবার উৎসগুলো থেকেও বিচ্ছিন্ন করে রাখছে (পৃষ্ঠা:২৩২,২৩৩,২৩৮)। তাই গার্ডনার মনে করেন, এই ধরনের গল্পগুলো যোগাযোগহীনতার রূপক হিসেবে বিশ্লেষণের দাবী রাখে।

লেখক দেখান শেভরনের বিকল্প জীবিকা কার্যক্রম (alternative livelihood programe) স্থানীয় জনগণের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ। কারণ এর দ্বারা দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় না। গার্ডনার মনে করেন যখন পর্যন্ত উন্নয়ন পলিসিগুলো 'সামাজিক পুঁজি' ('social capital'), 'বিচ্ছিন্নতার নৈতিকতা'[৫] ('the ethics of detachment') এবং 'আত্ম-সাহায্যকরণ'('self-help') এর মত বিষয়গুলোকে

আদর্শ নীতি হিসেবে গ্রহণ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত এর দ্বারা স্থানীয় জনগণের জীবন-জীবিকার কোন কল্যাণ সাধিত হবে না। তবে গার্ডনার মত প্রকাশ করেন সত্যিকারভাবে বহুজাতিক সংস্থার প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে শেভরন তখনই সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছে বলে দাবী করতে সক্ষম হবে যখন তারা সরকারের সাথে একটা বিস্তৃত চুক্তিতে যাবে; যেখানে তাদের জবাবদিহিতার বিষয়টি আরোও পরিস্কারভাবে থাকবে এবং যখন তারা জনগণের সংযোগগুলোকে (প্রাতিষ্ঠানিক ও অ-প্রাতিষ্ঠানিক) বিধিবদ্ধকরণের দ্বারা জনগণের প্রকৃত অধিকারসমূহ প্রদান করবে (পৃষ্ঠা:৫৫,৫৬)। উল্লেখ্য লেখক এখানে শুধু সমস্যার প্রকৃতি ও পরিধি নিয়ে আলোচনা করেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি এই সমস্যার সমাধানের দিকনির্দেশনাও প্রদান করেন। লেখকের মতে, প্রকৃত উন্নয়ন তখনই সম্ভব হবে যখন দরিদ্রতাকে সংযোগহীনতার বিষয় হিসেবে পাঠ করা সম্ভব হবে এবং একই সাথে উন্নয়নকে একটি কার্যক্রম (process) হিসেবে বিবেচনা করা হবে, যা প্রাতিষ্ঠানিক ও অ-প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগকে শক্তিশালী করতে কাজ করবে।

৫. কেটি গার্ডনারের বইটি নানা দিক থেকেই স্বতন্ত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে যারা প্রকৃতিক সম্পদ, বহুজাতিকতা এবং উন্নয়নের মধ্যকার আন্ত:সম্পর্ককেই খুঁজেন তাদের জন্যে বইটি অবশ্য পাঠ্য। কারণ গ্রন্থটিতে এই ধরনের অনুবন্ধ সম্পর্ককে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে এথনোগ্রাফিক তথ্যের আলোকে। তাছাড়া গৎবাধা উন্নয়ন ভাবনাকে নতুনভাবে দেখার সুযোগ তৈরী করে দেয় বইটি। প্রচলিত উন্নয়ন ভাবনায় যেখানে 'অংশিদারিত্ব', 'আত্মউন্নয়ন' ও 'আত্ম-সাহায্যকরণের' মতো বিষয়গুলোকে সামনে আনা হয়, তার বিপরীতে গ্রন্থটি এই সমস্ত ধারণাগুলোর প্রকৃত রূপকে হাজির করে পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক তথ্যের আলোকে এবং দেখায় যে এ সমস্ত উন্নয়ন রেটরিক কেবল কল্পিত নির্মাণ। যার সাথে বাস্তবতার কোন ধরনের মিল নেই। এক কথায় গ্রন্থটি বহুজাতিক সংস্থার উন্নয়ন কৌশল এবং একে কেন্দ্র করে বিভিন্নমুখি গতি-প্রকৃতির একটি জীবন্ত এথনোগ্রাফি। যার সহজ সরল প্রাঞ্জল উপস্থাপন এবং যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণ সমসাময়িক উন্নয়ন বাস্তবতা অনুধাবনে গ্রন্থটির কার্যকারিতা বা গ্রহণযোগ্যতাকেই প্রকাশ করে।

৫.১ গার্ডনারের কাজের স্বতন্ত্রতাকে নানা দিক থেকে বিশ্লেষণ করা যায়। প্রথমতঃ পশ্চিমা সমাজে বসবাস করে এবং নিজে পশ্চিমা হওয়া সত্ত্বেও স্বজাতিকেন্দ্রিকতাকে পরিহার করে কর্পোরেট উন্নয়নের বাস্তব চিত্র পর্যবেক্ষণে গার্ডনার যে দক্ষতার পরিচয় দেখিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। তাছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন কেন্দ্রিক ধারণায় নৃবৈজ্ঞানিক অংশগ্রহণ তাকে অবশ্যই অগ্রগণ্য করে রাখবে। বিশেষ করে যেখানে উন্নয়নের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পশ্চিমা মডেল দ্বারা আচ্ছাদিত, সেখানে তিনি হেজেমনিক বেড়াজাল ভেদ করে সঠিক ও বাস্তব চিত্র উন্মোচনে যে মুন্সিয়ানা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা একজন তৃতীয় বিশ্বের নৃবিজ্ঞানী হিসেবে আমার কাছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং শিক্ষণীয়। তাছাড়া উন্নয়ন রেটরিক হিসেবে প্রচলিত প্রত্যয়গুলোর (অংশগ্রহণ, অংশিদারিত্ব, আত্ম-সাহায্যকরণ ইত্যাদি) সঠিক ব্যবহার এবং স্থান, কাল নির্বিশেষে ঢালাওভাবে এর প্রয়োগের উপযোগিতার বিষয়টিকে প্রশ্নহীনভাবে স্বার্থক হিসেবে হাজির করার প্রবণতাকে গার্ডনার প্রশ্নবিদ্ধ করেন। পাশাপাশি এই প্রত্যয়গুলো যে পাশ্চাত্য ভূমিজাত এবং বিশেষ স্বার্থে আমদানিকৃত সেই বিষয়গুলোকেও তিনি খোলাসা করেন তার কাজে।

দ্বিতীয়তঃ উন্নয়নের সাথে নৃবিজ্ঞানের সম্পর্কের ঐতিহাসিক যোগসূত্রতা জ্ঞানকান্ডের গোড়া থেকেই চালু ছিল, যা কেটি গার্ডনারের অপরাপর লেখাসহ ডেভিড লুইস, ফার্গুসন (1990) ও এস্কোবারের (1995) লেখায় নানাভাবে প্রকাশিত হয়। যেখানে শক্তিশালী তত্ত্ব হিসেবে বিবর্তনবাদ এবং পরবর্তীতে নব্য-বিবর্তনবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে উন্নয়ন ও অনুন্নয়নের বিষয়গুলোকে রাজনীতিকরণ করা হয় নব্য-উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে। একই ঐতিহাসিক পরিক্রমায় উন্নয়ন ধারণাটিকে নানা সময়ে নানা আঙ্গিকে হাজির করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয় বিশ্বের জন্যে যার একটি সফল উদাহরণ হয়ে উঠেছে বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্র, যেখানে বহুজাতিক সংস্থা নিজেদের মনগড়া উন্নয়ন ভাবনাকে নিজেদের বৈশ্বিক পুঁজিবাদী লক্ষ্যপূরণের স্বার্থে হাজির করে। যা একভাবে পশ্চিমা আধিপত্যবাদী মনোভাবেরই পরিচায়ক এবং পূর্বের মতো এই ব্যাখ্যাও যে নব্য-উপনিবেশবাদের স্বার্থেই সৃষ্ট সে বিষয়টিকেও স্পষ্ট করেছেন গার্ডনার তার কাজে। তাছাড়া গ্রন্থটি তৃতীয় বিশ্বের খনিজ সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে শেভরনের মতো বহুজাতিক কর্পোরেট সংস্থাগুলোর উন্নয়ন ধারণার গূঢ় রহস্যকে নতুন ভাবে উন্মোচিত করে এবং এই বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার সুযোগ তৈরী করে দেয়।

তৃতীয়তঃ কর্পোরেট উন্নয়ন প্রসঙ্গে নব্য-উদারনৈতিক ভাবনার সাথে জাতীয়তাবাদী এক্টিভিস্টদের অবস্থানের বৈপরিত্যকে প্রকাশের পাশাপাশি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে একটিভিস্টদের ভাবনার পার্থক্যের মূল জায়গাটিকেও গার্ডনার তার কাজে পরিষ্কারভাবে ফুঁটিয়ে তুলেছেন। তিনি দেখান জাতীয়তাবাদী একটিভিস্টদের ব্যাখ্যায় যেখানে মার্ক্সবাদী বিশ্লেষণের আদলে বৈশ্বিক যোগাযোগ, ক্রমোচ্চাতার মত বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে, সেখানে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ব্যাখ্যার পাটাতন হিসেবে কাজ করে স্থানিক জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতা। গার্ডনার এই বিষয়টিকে খোলাসা করার মধ্য দিয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিশ্লেষণাত্মক অবস্থানের স্বকীয়তাকে সামনে আনেন। যা একভাবে নৃবিজ্ঞানী হিসেবে মানুষকে এবং তার ভাবনাকে গুরুত্বসহকারে অনুধাবন করার তাগিদকে সামনে আনে। অনেক ক্ষেত্রেই এই বিষয়টি হেজেমনিক আধিপত্যের বাতাবরণে ঢাকা পড়ে যায়। সেই আচ্ছাদনের পরিমার্জনার গুরুত্বের অনুধাবনে গার্ডনার অবশ্যই দিক-নির্দেশনা দিতে সক্ষম হয়েছেন এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

চতুর্থত: গার্ডনার উন্নয়নের একরৈখিক নির্দেশনা থেকে বেরিয়ে আসেন এবং বহুরৈখিক বিষয়াবলীর যুক্ততার যৌক্তিকতাকে হাজির করে দেখাতে সক্ষম হন যে, এগুলো স্থান, কাল, প্রেক্ষিত বিবেচনায় কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। যেমন তিনি দেখান উন্নয়নের একরৈখিক নির্দেশনায় কেবলমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ বা যোগাযোগকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখানো হয়। কিন্তু তার গবেষিত এলাকা দুনিয়াপুরে কাজ করতে গিয়ে তিনি দুধরনের সংযোগ বা যোগাযোগের সাথে পরিচিত হন। একটি হল প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ যার ভিত্তি হল সম্পদের বৈধ মালিকানা, চুক্তি এবং অধিকারসমূহ; অন্যটি অপ্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ যার ভিত্তি সামাজিক সম্পর্ক এবং নৈতিকতা। তিনি দেখান এই দুই ধরনের সংযোগ একে অপরের সাথে এমনভাবে সর্ম্পকিত থাকে যে খুব সহজে এদেরকে আলাদা করা যায় না। ফলে তার কাজে প্রকৃত উন্নয়ন ব্যাখ্যায় প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সংযোগের সহাবস্থানের গুরুত্বের বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। যা সংযোগ অধ্যয়নে নতুন মাত্রা যোগ করেছে বলেই আমার বিশ্বাস। তাছাড়া উন্নয়নের যে সদর্থক প্রতিপাদ্য (প্রগতি, প্রবৃদ্ধি, বৃদ্ধি ইত্যাদি) হাজির করা হয়

তার বিপরীতে উন্নয়ন যে বেসুরো, বেতাল, মিলহীন, বিরোধী হতে পারে এহেন ভাবনা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন গার্ডনার। যা সত্যিকার অর্থে উন্নয়ন ভাবনায় নতুন সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হবার দাবি রাখে।

৬. গার্ডনারের গ্রন্থটি আমাদের চারপাশের সমকালিন উন্নয়ন বাস্তবতা বুঝতে সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হয়। বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পরিচালিত উন্নয়ন কর্মকান্ডগুলোকে বিশ্লেষণাত্মকভাবে দেখার সুযোগ তৈরী করে দেয় এ গ্রন্থটি। প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, বাংলাদেশের প্রেক্ষিত বিবেচনায় উন্নয়নকে কি কেবল বহুজাতিক সংস্থা দ্বারা প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলন, বা প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্য ধ্বংস করে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, অথবা নিজস্ব অর্থায়নে সেতু নির্মাণ, কিংবা যানজট সমস্যা নিরসনে গণপরিবহন বৃদ্ধি না করে উড়াল সড়ক নির্মাণ, এমনকি জনগণের বার্ষিক মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেখা যায়? নাকি বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বিষয়টিকে দেখার অবকাশ রয়েছে। এক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষ, যারা এই সমস্ত উন্নয়ন কর্মকান্ডের সরাসরি ভুক্তভোগী, যাদের জীবিকা, পেশা, বসতি এই বিষয়গুলোর সাথে জড়িত তাদের উন্নয়ন ভাবনা এবং তাদের প্রত্যাশার জায়গাগুলি কি বিবেচনায় আনা জরুরি নয়? এই আলোচনায় প্রেক্ষিতে এই রকম ভাবা ঠিক হবে না যে, আমি এই ধরনের উন্নয়ন কর্মকান্ডের পক্ষে নই। এখানে বিষয়টি পক্ষে বিপক্ষের নয় বরং বিষয়টি বোঝাপড়ার।

উন্নয়নের নামে বহুজাতিক সংস্থাগুলোর সহায়তায় প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলনে, কিংবা বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় বা উড়াল সড়ক নির্মাণে কারা বেশি উপকৃত হচ্ছে? বা কাদের স্বার্থ এখানে রক্ষা করা হচ্ছে? এই প্রশ্নগুলো এখানে উত্থাপন করা একান্ত জরুরি। কেননা আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বিদেশী বিনিয়োগকারীদের স্বার্থকেই প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেশীয় বিশেষ (ধনী) শ্রেণির স্বার্থকে রক্ষা করা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে স্বার্থ রক্ষা করার কথা স্থানীয় জনগণের বা আরো বৃহত্তর পরিসরে বললে বলা যায়, ঐ নির্দিষ্ট দেশ, দেশের পরিবেশ এবং সর্বপরি দেশের মানুষের। যেহেতু সরাসরিভাবে তাদের জীবন-জীবিকা, পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে ফলে তাদের মতামত ও দাবীর প্রেক্ষিতেই উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনা করা যুক্তিযুক্ত। আর এই যুক্তিসঙ্গত বিষয়টি যথাযথভাবে মানা হলে উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ে কোন ধরনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত বা অনিশ্চয়তা লেগে থাকার কথা ছিল না। কিন্তু বাস্তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে আমরা এর বিপরীত চিত্রই লক্ষ্য করছি। হবিগঞ্জের বিবিয়ানা, টেংরাটিলা, চুনারুঘাট, গাইবান্দার গোবিন্দগঞ্জ, বাগেরহাটের রামপাল, চট্টগ্রামের বাঁশখালি সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে রাষ্ট্রীয় তথাকথিত উন্নয়ন উদ্যোগের বলি হচ্ছে সমাজের সবচেয়ে প্রান্তিক মানুষ এবং তাদের শেষ সম্বলটুকু। রাষ্ট্র যেখানে মানুষের অধিকার রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকার কথা, সেখানে দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে কর্পোরেট স্বার্থ রক্ষায় মরিয়া হয়ে উঠছে। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে ভয়ংকর নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা পরায়ণ নীতি অনুসরণ করছে রাষ্ট্র।

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (একনেক) হিসেব অনুযায়ী ২০১৬ সালে বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় হবে ১৪৬৬ ডলার, যা বিগত বছরের তুলনায় ১৫০ ডলার বেশী (প্রথম আলো, ২০১৬)। এভাবে পাশ্চাত্য যুক্তিশীল কায়দায় মাথাপিছু আয়ের হিসাব কষে কি একটি ঐতিহ্যবাহী দেশের আপামর জনসাধারণের প্রকৃত উন্নয়ন পরিমাপ কার যায়? তাছাড়া দুই জনপদের মানুষকে কেবলমাত্র সেতু দ্বারা সংযোগ

করাই কি উন্নয়ন? বা আদিবাসিদের পাহাড় দখল করে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ করাই কি উন্নয়নের নিদর্শন? যেখানে উন্নয়ন কার্যক্রমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক অধিকার, দাবী, নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, সংস্কৃতিসহ জীবন-জীবিকার বিষয়গুলো উপেক্ষিত সেখানে 'উন্নয়ন' কোন ইউটোপিয় ধারণাকে সামনে আনে তা সহজেই অনুমেয়।

তাই উন্নয়ন প্রশ্নে এখন দেখতে হবে কাদের জন্য উন্নয়ন? কোন প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন? কাদের দ্বারা উন্নয়ন? কিসের বিনিময়ে উন্নয়ন? এবং এই প্রশ্নগুলোর সঠিক সদুত্তর পাওয়ার প্রেক্ষিতে উন্নয়নকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী করতে হবে। উন্নয়ন'কে নিয়ে প্রশ্ন করায় আমি কোন সমস্যা দেখি না। এর দ্বারা উন্নয়নবাদীদের মাছের মায়ের পুত্র শোকের মত বিলাপ পাড়ারও কিছু আছে বলে মনে করি না। কারণ এই প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দিতে না পারলে প্রকৃত উন্নয়ন কতটুকু নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বা আদৌ সম্ভব হবে কি না সেটি প্রশ্ন সাপেক্ষ বিষয় হিসেবে থেকে যাবে। স্থানীয় জনগণের মতামত ও দাবীদাওয়ার প্রেক্ষিতে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা না করলে এবং সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে না পারলে প্রকৃত উন্নয়ন কোনভাবেই বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হবে না। এটিকেই গার্ডনার হয়তো বলতে চেয়েছেন স্থানিকতাকে বাদ দিয়ে যে উন্নয়ন সেটি আসলে কি প্রকৃত উন্নয়ন, নাকি বিসদৃশ উন্নয়ন?

টীকা

[১] গবেষণার নৈতিকতার দিকটি বিবেচনায় রেখে গার্ডনার তার গন্থে গবেষিত গ্রামের ছদ্ম নাম হিসেবে 'দুনিয়াপুর' ব্যবহার করেছেন।

[২] অপ্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক সম্পর্ক বলতে এখানে জ্ঞাতি, গোষ্ঠী ভিত্তিক সম্পর্ক এবং নৈতিকতার ভিত্তিতে গড়ে উঠা পাতানো ও কাল্পনিক সম্পর্ককে নির্দেশ করা হয়েছে।

[৩] স্থানীয়ভাবে ইংল্যান্ডে অভিবাসি বাংলাদেশী সিলেটিদের এই নামে ডাকা হয়।

[৪] জাতীয়তাবাদী অ্যাক্টিভিস্ট বলতে এখানে তাদেরকেই বোঝানো হচ্ছে যারা জাতীয় সম্পদ ও স্বার্থ রক্ষায় সর্বদা সোচ্চায় ও আন্দোলনরত। বিশেষ করে, যারা তৃতীয় বিশ্বের দেশাগুলোতে বহুজাতিক সংস্থার অনুপ্রবেশের ঘোর বিরোধী।

[৫] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, Cross. J (2011) Detachment as Corporate Ethic: Materializing CSR in the Diamond Supply Chain, *Focaal-Journal of Global and Historical Anthropology*, 60, pp. 34-46.

তথ্যসূত্র

মূল পাঠ্যঃ

Gardner, K. (2012). *Discordant Development: Global Capitalism and the Struggle for Correction in Bangladesh.* London: Pluto Press.

সহায়ক পাঠ্য হিসেবে দেখতে পারেন ঃ

Auty, R. (1993). *Sustainable Development in Mineral Economics: The Research Curse Thesis.* London: Routledge.

Ballard, C. (2003). Resource Wars: The Anthropology of Mining. *Annual Review of Anthropology,* 32, pp. 287-313.

Collier, P. (2007). *The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and What Can Be Done about it.* Oxford: Oxford University Press.

Cross. J. (2011). Detachment as Corporate Ethic: Materializing CSR in the Diamond Supply Chain, *Focaal-Journal of Global and Historical Anthropology*, 60, pp. 34-46.

Escober, A. (1995). *Encountering Development: The Making and Unmaking of the third world.* New Jersey: Princeton University Press.

Ferguson, J. (1990). *The Anti Politics Machine: 'Develoment', Depoliticisation, and Bureaucratic Power in Lesotho.* Cambrige: Cambrige University Press.

Gardner, K. (1997). Mixed Messages: Contested "Development" and the Plantation Rehabilitation Project, R. Grillo and R.L Stirrat Eds. *Discourses of Development: Anthropological Perspective.* Oxford: Berg, pp. 133-157.

Gardner, K. and Ahmed, Z. (2009). Degrees of Separation: Informal Social Protection, Relatedness and Migration in Biswaqnath, Bangladesh. *Journal of Development Studies,* 45 (1).

Gardner, K. and Lewis, D. (1996). *Anthropology, Development and the Post Modern Challenge.* London: Pluto Press.

Gardner, K. and Lewis, D. (2000). Dominant Paradigms Overturned or "Business as usual"? Development Discourse and the White Paper on International Development'. *Critique of Anthropology*, 20(1), pp. 15-29.

Putnam, R.D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community.* New York: Simon and Schuster.

Sen, A. (1982). *Poverty and Faminies: An Essay of Entitlement and Deprivation.* Oxford: Oxford University Press.

Sen, A. (1999). *Development as Freedom.* Oxford: Oxford University Press.

Vertovec, S. (2010). *Transnationalism.* London: Routledge.